প রি ক্র মা

প্রাণপুরুষ

''হরি গেল মধুপুরী হাম কুলবালা
বিপথে পড়ল সই মালতীর মালা...''

তন্ময় হয়ে গাইছেন তরুণ সাধক। অশ্রু গাল ছাপিয়ে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। অন্তরের ব্যথা ঝরে পড়ছে অশ্রু হয়ে। তাঁকে সঙ্গত করছেন আর-এক যুবা। তাঁর মুখমণ্ডলও ভাবে আরক্তিম। তাঁরও মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

কয়েক মাস আগে নরলীলা সংবরণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরঙ্গ পার্ষদদের হৃদয় বিক্ষত, রক্তাক্ত। বিরহ—সে তো দহন! নিরন্তর দগ্ধ হয়ে চলেছে অন্তর। কাশীপুর শ্মশানে নিভে-যাওয়া চিতা বুকের ভিতর ধু ধু করে আজও জ্বলছে। দেহধারী ভগবানের ভালবাসার সঙ্গে কি তুলনা হয় কিছুর? তরুণ তাপসেরা ঘরবাড়ি পরিজন ছেড়েছেন সেই ভালবাসার টানে। থাকবার স্থান নেই, সামান্য অর্থে বরানগরে একটি ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ি ভাড়া করে আছেন। খাবার নেই, ভিক্ষা করে আনা দুমুঠো আকাঁড়া চাল ফুটিয়ে খান বাগানের অযত্নবর্ধিত তেলাকুচো পাতার ঝোল দিয়ে। পরবার কাপড় নেই, একটিমাত্র বহির্বাস—সর্বজনীন। বহিরাগত কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে সেটিই অঙ্গে জড়িয়ে নেন। শীতকালে তাঁদের দেখে অবাক হয়ে মানুষ বলে, ''লেপ-কাঁথা-কম্বল গায়ে দেওয়া দেখেছি, কিন্তু দেওয়াল গায়ে দেওয়া কখনও দেখিনি!''

এত কৃচ্ছ্রতা, কিন্তু গায়ে লাগে কই! জগতটাই তো তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। যা হারিয়েছেন, তার তুলনায় কোনও কষ্টই আর কষ্ট বলে বোধ হয় না। যে-ভালবাসা মাথার উপর বটবৃক্ষের শীতল ছায়া বিছিয়ে ছিল, তার স্থূল রূপখানি সরে যেতে মর্মস্থল যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ-বিরহই এখন বড় একান্ত সত্য। চারপাশের বাস্তব জগৎ তার সত্যতা, গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। কৃষ্ণবিরহে রাধারানির কী দশা হত, তা যেন একটু একটু বোঝা যাচ্ছে। তাই তাঁদের মনে ভেসে উঠছে ওই বিরহের গান : হরি গেল মধুপুরী...। মথুরা চলে গিয়েছেন কৃষ্ণ। গোপীদের হৃদয়-নিংড়ানো ব্যথা রূপ পেয়েছে সংগীতে। বিরহই যেন চিরন্তন বিধিলিপি। শ্যামচন্দ্র যখন ব্রজে ছিলেন, তখনও তাঁর সন্ধানে কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরতেন তাঁরা। হৃদয়পাত্রে যখন বেদনা আর ধরত না, তখন আর্তনাদ করতেন—''দয়িত দৃশ্যতাম্''—দেখা দাও, দেখা দাও।

''সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।'' মানুষের মনে জগতের ছায়া থাকলে সেই অপূর্ব ভালবাসা জাগে না। জগৎ ছিল না ব্রজসুন্দরীদের অন্তরে। ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের মনেও। ভিন্ন আঙ্গিকে যেন আবার অভিনীত হল অভিরাম সেই প্রেমলীলা। যাঁরা সেই লীলাবিগ্রহ, তাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায় বললে—'হাড়শুদ্ধ'। নতুন হাঁড়িতেই দুধ রাখতে হয়, নইলে তা নষ্ট হয়ে যায়। গোপীরা ছিলেন সেই সদ্যপ্রস্তুত মৃৎপাত্র। শ্রীভগবানের প্রেম ধারণের উপযুক্ত পাত্র। সংসারের প্রতি মায়ামোহের লেশ ছিল না মনে। উনিশ শতকের শেষে যুগাবতারের প্রেম ধারণ করতেও দরকার হল অমন উপযুক্ত পাত্রের। বস্তু যেমন, তাকে রক্ষা করবার পাত্রও তো তেমনই প্রয়োজন হয়। সবজি রাখার ঝুড়িতে কি রত্ন রাখা চলে? অবতীর্ণ ভগবানের মহাপ্রেম, ভাবাদর্শ সঞ্চয় করে রাখতে হবে বিশ্বমানবের কল্যাণে, অনাগত কালের জন্য। জড়বাদের গরলকে অমৃতায়িত করবে সেই প্রেম।

সে-মহাসম্পদ যাঁরা ধারণ করলেন ভাবী জগতের কল্যাণে, তাঁদের পাত্রত্ব কতদূর তা আর কল্পনার অবকাশ রাখে না। বিধিনির্দিষ্টই তাঁরা। তবু

তপস্যার অগ্নিতে শুদ্ধ করলেন নিজেদের। পরিণত বয়সে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, বিবেকানন্দের কীর্তি শুধু আর-এক বিবেকানন্দই বুঝতে পারেন, তেমনই এই তাপসরাও অনুভব করেছিলেন নিজেদের জগৎছাড়া মহিমা। সে-গরিমা তাঁরা ফুটিয়েছেন একটিমাত্র বিশেষণে—'দানা'। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষণিক বিষয়ে ডুবে থাকা জগতের তুলনায় তাঁরা 'দানব'—ত্যাগে তপস্যায় বৈরাগ্যে প্রেমে। অন্তরে জ্বলন্ত প্রেম—'শ্রীরামকৃষ্ণ' তথা এক মূর্ত ভাবাদর্শের প্রতি। তাঁর দেহ থাকতেই নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ''দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন।'' দেহযন্ত্রণায় কাতর আচার্যকে হরিনাথ বলেছিলেন, ''আপনি আনন্দময় পুরুষ।'' রাখাল, শরৎ, শশী তাঁকে সর্বনিয়ন্তা জ্ঞান করতেন।

তাঁর লৌকিক বিচ্ছেদ সহ্য করা সহজ নয়। অন্তরঙ্গ সন্তানদের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁদের বয়স অল্প, নির্মল অন্তর ঈশ্বরপ্রেমে পূর্ণ। জীবনসর্বস্ব আচার্যের অদর্শনের কষ্ট তাই তাঁদের মনের সব আগল খুলে দিয়েছে। দেহমনের যাবতীয় অবলম্বন ছেড়ে তাঁরা ভগবানের জন্য কাঁদছেন। সারাদিন ধ্যানজপ, সারারাত তাঁর বিরহে জেগে থাকা। মহানিশায় তাঁরা ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর। মধ্যরাতে ''যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'' গাইতে গাইতে অসহায় শিশুর মতো কাঁদছেন কেউ। বাইবেলে ভগবান যিশুর মুখের কথা—''(সব ছেড়ে) আমার কাছে চলে এসো, আমি শান্তি দেব''—পাঠ করতে করতে অশান্ত হৃদয়গুলির চোখের জল আর বাধ মানছে না। তাঁদের যিনি নেতা—পুরুষসিংহ—রাত পোহালে দেখা যাচ্ছে তাঁর বালিশটি অশ্রুতে এমন সিক্ত যে নিংড়োলে জল পড়বে!

এই শুদ্ধসত্ত্ব মহাসাধকদের নিখাদ 'নিকষিত হেম' ভালবাসা যেখানে, সেই ব্যাকুলতাভরা হৃদয়গুলিই তো ভগবানের সবচেয়ে প্রশস্ত সুখদ সিংহাসন! পবিত্র অন্তরের পবিত্র প্রেমের প্রতিই যে তাঁর মহালোভ! যথার্থ পবিত্র হৃদয়, যথার্থ পবিত্র প্রেম ভগবানকে তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁদের গায়ে লাগেনি 'মলামাটিমাখা' ধরণীর ধূলি। তাঁরা অবতারপুরুষের চিহ্নিত পার্ষদ পরিকর। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরকোটি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্রেম ঈশ্বরকোটিরই হয়, জীবকোটির হয় না। তাঁদের কেউ বা আধিকারিক পুরুষ। যুগে যুগে অবতারের পার্ষদ। অবতারের ভাব যথাযথ রূপায়িত হতে বহু শতাব্দী লেগে যায়। প্রথম যাঁরা সে-ভাবকে একটি আকার দেন, তাঁদের শক্তি অনন্যসাধারণ। ওই অসাধারণ পুরুষরাই সে-শক্তি রাখেন। আর অবতারের ওই ভাবাদর্শের সৌধ গড়ে ওঠে পার্ষদদের পবিত্রতা ও প্রেমের ভিত্তির উপর।

অবতার যখন আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন ওই 'কলমির দল'কে। কারণ, সাধারণ জীবের সঙ্গে তাঁর অতি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হলেও, অন্তরঙ্গ জনেদের সঙ্গে নিভৃত একান্ত সম্পর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের জন্য কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে কাঁদতেন। ক্রমাগত বিষয়ী মানুষের সঙ্গ তাঁর আর ভাল লাগত না। তাই তিনি চাইতেন সেই নির্মল মনগুলিকে, যেগুলিকে তিনি কাদার তালের মতো গড়েপিটে নেবেন। ঈশ্বরপরায়ণ অন্তরগুলির সঙ্গে হৃদয়ের বার্তা বিনিময় করবেন।

অবতারপুরুষেরা যুগে যুগে প্রাণপুরুষ। মনের অবলম্বন, প্রাণের আরাম, আত্মার আত্মীয়। মধুর লোভে অলির মতো—না জেনে পরমের আকর্ষণে যাঁরা এসে জোটেন চারপাশে—তাঁদেরও। যাঁরা অবতার জেনে পূজা করেন, তাঁদেরও। আবার যাঁদের 'না দেখে নাম শুনে কানে, মন গিয়ে তাঁয় লিপ্ত হল'—তাঁদেরও। সকলেরই, সবকিছুরই। সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা...। একজন রামচন্দ্র, একজন শ্রীকৃষ্ণ, একজন বুদ্ধদেব দেশ-মহাদেশের সংস্কৃতিকে দু-বাহুতে ধারণ

করেছেন। তাঁরা সভ্যতার প্রাণপুরুষ, সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ। তৎসত্ত্বেও তাঁদের ''দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না।'' শ্রীরামকৃষ্ণকে শতশত মানুষ সমাধিস্থ হতে দেখেছেন, কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁকে ধারণ করতে পারতেন শুধু বাবুরাম। কত সাধক তাঁকে অবতার বলেছেন, কেউ বা বলেছেন—অবতারেরা যাঁর অংশে যাঁর শক্তিতে অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তিনিই। কেউ আবার ঘোষণা করেছেন—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। এত বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ ছেড়ে অজানিতের পথে চলে গেছেন নানান কারণে। অন্তরঙ্গেরা কিন্তু তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারেননি। তাঁরা যেন—শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথায়—'নাটমন্দিরের ভিতরের থাম'।

অবতার যেমন যুগে যুগে একই সত্তা, 'একই চাঁদ রোজ রোজ', তেমন তাঁর পার্ষদরাও যুগান্তরের সঙ্গী। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''যারা সব এসেছিল তারাই এসেছে।'' রাখাল কৃষ্ণসখা। যোগীন অর্জুনের, বাবুরাম শ্রীরাধার, হরিপ্রসন্ন জাম্বুবানের অংশজাত। নিরঞ্জনকে ঠাকুর বলেছিলেন, ''তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।'' রাজা দশরথ না নন্দ—কে এসেছিলেন কে বলবে! তারকের ''উচ্চ শক্তির ঘর—যেখান থেকে নামরূপের উৎপত্তি হচ্ছে।'' শরৎ আর শশী এসেছিলেন 'ঋষি কৃষ্ণের দল' অর্থাৎ ভগবান যিশুর শিষ্যদল থেকে। এঁরা কেউ কম নন। অবতারের দুটি উদ্দেশ্য থাকে—ধর্মের গ্লানি দূর করে ধর্মসংস্থাপন এবং রসাস্বাদন। এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ওই অসীম শক্তিধর সঙ্গীদের প্রয়োজন। বিশেষত 'রসাস্বাদন' ব্যাপারটি যেন হাতির ভিতরের দাঁতের মতো। বাইরে থেকে দেখা যায় না অথচ হাতির নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য তার প্রয়োজন। পার্ষদরা এভাবেই অবতারলীলার পুষ্টি সাধন করেন। যেন সকলের প্রতি অবতারকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়, আর পরিকরদের সঙ্গে তাঁর একান্তে লীলা আস্বাদন। তাঁদের প্রতি যেটুকু কর্তব্য তা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন : শুধু জানিয়ে দেওয়া—তিনি কে আর তাঁরা কে। ঘরে-বাইরে সকলের সঙ্গে মিশে সব কাজ করেও মানুষ একা হতে চায়, নিজের সঙ্গে কাটানোর মতো কিছু সময় তার দরকার হয়। অবতারের ক্ষেত্রে যেন পার্ষদদের সঙ্গে লীলা ওই নিজের সঙ্গে সময় কাটানো। ভাগবত বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করতেন—ঠিক যেমন শিশু তার নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে। তাঁরা ভগবানেরই অংশ—পৃথক নন। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''রাখাল শরৎ টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েছে।'' তাই তাঁদের সঙ্গে ভগবানের যে-অপার্থিব প্রেমের সম্বন্ধ, তা আর কারও সঙ্গেই সম্ভব নয়। তাঁদের প্রেমে চাওয়া-পাওয়া নেই। কাশীপুরে নববর্ষের দিন শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক কৃপাবিতরণ দূর থেকে দেখেও পার্ষদরা তাঁর কাছে কিছু পেতে ছুটে আসেননি, তাঁর ঘরটি পরিষ্কার করতে হবে বলে। ঠাকুরের দেহমনের স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর কিছুরই প্রয়োজনবোধ নেই।

কালের স্রোত আপন গতিতে বয়ে চলে। মহাকালের গ্রাস থেকে কারও নিস্তার নেই। যিনি 'অনাদিনিধন', জন্মমৃত্যুহীন, তাঁরও মরতনু কালের কবলিত হয়। সে-বিরহদহন সয়ে পার্ষদেরা রূপ দেন তাঁর আদর্শকে। কাল পূর্ণ হলে দিব্যধামে প্রস্থান করেন তাঁরাও। কিন্তু সম্পূর্ণ হারিয়ে যান না—অবতারের মতোই। কালসাগরের তরঙ্গে ভেসে ভেসে ওঠে তাঁদের রত্নছবি। তাঁদের ত্যাগ-তপস্যা, নিঃস্বার্থ প্রেম, করুণা বিতরণ—মানুষ ভোলে কী করে? শত শতাব্দীর ব্যবধান ঘুচিয়ে জেগে থাকে তাপদগ্ধ মানবাত্মার প্রতি তাঁদের অনন্ত ভালবাসা। কালান্তরের পর্দা সরিয়ে অবতারের মতোই তাঁরাও পুণ্যপরশ দিয়ে যান কৃপাবুভুক্ষু প্রাণে। হয়ে ওঠেন প্রাণপুরুষ। হয়ে যান 'ধেয়ানের আলোকরেখা।'